বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

-প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি জনাব মো: নুরুজ্জামান

বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান

ফৌজদারী আপিল নং ০২/২০১২

(হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারি আপিল নং-৩৭৯/২০০০ এর ০৭.০৫.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত)

শফিকুল ইসলাম : .... **আপীল্যান্ট**

-বনাম-

রাষ্ট্র : .... **রেসপনডেন্ট**

আপীল্যান্টের পক্ষে : জনাব মো: নওয়াব আলী, অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড (মৃত)

রেসপনডেন্টের পক্ষে : জনাব বিশ্বজিৎ দেবনাথ, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল,

জনাব মোঃ শামসুল আলম, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড এর নির্দেশনায়।

রায়ের তারিখ : **১৩ ই জানুয়ারী, ২০২১**

রায়

সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, প্রধান বিচারপতি: এই ক্রিমিনাল আপিল বাই লিভ, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০০০ সালের ক্রিমিনাল আপিল নং-৩৭৯, তারিখ: ০৭.০৫.২০০৭ এ প্রদানকৃত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যেখানে হাইকোর্ট বিভাগ আপিলটি খারিজ করে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, যশোর কর্তৃক ১৯৯৮ সালের দায়রা মামলা নং-৩৫, তারিখ ১৪.০২.২০০০ এ প্রদানকৃত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে আরোপিত দন্ডাদেশ এবং সাজা বহাল রাখে। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত যশোর, আপিলকারী এবং

অন্য দুই অভিযুক্তকে দন্ডবিধির ধারা ৩০২/৩৪ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড সহ প্রত্যেককে ৫০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান করে, অনাদায়ে আরো ৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ভোগের আদেশ প্রদান করে।

সংক্ষেপে যে ঘটনাসমূহ হতে এই সিভিল আপিলটির সূত্রপাত হয়েছে সেগুলো হলো:

রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি সংক্ষেপে হলো, মোঃ শাহজাহান নামক ব্যক্তি মৌখিকভাবে ২২.১২.১৯৯৬ তারিখ আনুমানিক ৯.৪৫ টার সময় শার্শা থানার অফিসার ইনচার্জকে জানিয়েছিলেন যে তার বড় ছেলে মো: রওশন আলী ২১.১২.১৯৯৬ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন এবং তার মৃতদেহ ২২.১২.১৯৯৬ তারিখ সকালে নুরু মোল্লার খেঁজুর বাগানে পাওয়া যায়। বলা হয়েছিল যে ভিকটিম রওশন আলী ঘটনার রাতে কিছু ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে বাগানে যান এবং সেখানেই মারা যান। তদনুসারে, ১৯৯৬ সালের শার্শা থানা ইউ.ডি মামলা নং-৩৯, তারিখ ২২.১২.১৯৯৬ দায়ের করা হয়। রওশন আলীর মৃতদেহ উদ্ধারের সময় তার শরীরের বিভিন্ন অংশে কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং ধারণা করা হয় যে ভিকটিমকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এদিকে নিহত রওশন আলীর পিতা শাহজাহান আলী ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে অভিযুক্ত মোঃ শফিকুল ইসলামকে থানায় সোপর্দ করেন এবং জানান যে, অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম ২১.১২.১৯৯৬ তারিখ সন্ধ্যায় ভিকটিম রওশন আলীকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। ওই রাতে ভিকটিম রওশন আলী আর বাড়ি ফিরে যাননি পরদিন সকালে খেঁজুর বাগানে একাধিক জখম অবস্থায় রওশন আলীর মৃত দেহ পাওয়া যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে জিডি নং ৯৭৮ দায়ের করা হয়েছিল এবং আসামি মো: শফিকুল ইসলামকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছিল। ২৬.১২.১৯৯৬ তারিখে, যশোর জেনারেল হাসপাতাল থেকে তদন্ত কর্মকর্তা মৃত রওশন আলীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পান যেখানে ডাক্তার অভিমত দেন যে মৃত্যু শক এবং ইন্ট্রাক্রানিয়াল রক্তক্ষরণের কারণে হয়েছে যা মৃত্যু পূর্ববর্তী আঘাতজনিত এবং নরহত্যা প্রকৃতির। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম,

মোঃ নাসির ও মোঃ নুরুজ্জামান জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তারা ভিকটিম রওশন আলীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় এবং সে অনুযায়ী একটি নিয়মিত এফআইআর দায়ের করা হয়।

তদন্তের পরে পুলিশ দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম, আবদুল খালেক ও নাসিরের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। অভিযুক্ত হামজার আলী, নুরুজ্জামান ও রিজাউলের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি।

বিচারের জন্য মামলার রেকর্ড দায়রা জজ আদালত, যশোর এ প্রেরণ করা হয়। ০৯.০৭.১৯৯৮ তারিখে অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম, আবদুল খালেক ও নাসিরের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং অভিযোগটি পড়ে শুনানোর পর তারা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, যশোর, উভয় পক্ষের শুনানি শেষে, ১৪.০২.২০০০ তারিখের দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজার রায় ও আদেশের মাধ্যমে আপিলকারী এবং অন্যান্য দুই আসামিকে দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডসহ প্রত্যেককে ৫০০০/- টাকা জরিমানা প্রদান করে, অনাদায়ে আরো ৩ (তিন) বছরের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ভোগের আদেশ প্রদান করে।

বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বোক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী শফিকুল ইসলাম হাইকোর্ট বিভাগে ২০০০ সালের ফৌজদারি আপিল নং-৩৭৯ দায়ের করেন। ০৭.০৫.২০০৭ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ বিচারকগণ আপিলটি খারিজ করেন এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ ও সাজা বহাল রাখেন।

হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী শফিকুল ইসলাম আপিল বিভাগে ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-৮১/২০১০ দায়ের করেন এবং ১৬.১০.২০১১ তারিখে আপীলটি পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্ত হন, যার ফলে ক্রিমিনাল আপিল নং-০২/২০১২ এর উদ্ভব ঘটে।

এই ফৌজদারি আপিলটি দায়ের করেছিলেন প্রয়াত মো: নওয়াব আলী, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড। বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ডের মৃত্যুর পর আপিলকারীকে তার মৃত্যুর বিষয়টি অবহিত করে নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি নতুন কোনও বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড নিয়োগ করেননি।

যেহেতু আপিলকারীর পক্ষে কেউ এই আপিলটি শুনানি করতে উপস্থিত হয়নি এবং এটি একটি দীর্ঘ বিচারাধীন মামলা, সুতরাং আমরা নিজেরাই শুনানির জন্য আপিলটি গ্রহণ করেছি। বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত তথ্যের ভিত্তিতে লীভ মঞ্জুর করা হয়েছিল।

"হাইকোর্ট বিভাগ অযথার্থভাবে পিডব্লিউ ৫ কে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বিশ্বাস করেছিল। হাইকোর্ট বিভাগ এটি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে ঘটনার ১৫ (পনের) দিন পরে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল তাতে তথ্যদাতা অভিযোগ করেননি যে তিনি (পিডব্লিউ-৫) ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড আমাদের পিডব্লিউ-৪ কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণ দেখিয়েছেন, ভুক্তভোগীর বাবা যিনি এই ঘটনায় জিডি এন্ট্রি করেছিলেন, তিনি জিডিতে অভিযোগ করেননি যে পিটিশনার নিহতের হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন বা তাকে কোনো কারণে ভুক্তভোগীর আক্রমণকারী হিসাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার সময় টর্চ লাইট দ্বারা আবেদনকারীকে তাদের শনাক্তকরণ এবং ঘটনাস্থলে আবেদনকারীকে আটকানোর কথিত গল্প সম্পর্কে পিডব্লিউ-৪ এবং ৫ এর বেমানান বক্তব্য রয়েছে। বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড এর বক্তব্য অনুসারে, এই গল্পটি পরবর্তীকালে চালু করা হয়েছিল, কারণ যদি আবেদনকারীকে ঘটনাস্থলে আক্রান্ত ব্যক্তির হত্যাকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে প্রাথমিকভাবে ইউডি মামলা দায়ের করার এবং পরবর্তীতে আবেদনকারীর নাম উল্লেখ ছাড়াই একটি জিডি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ বিচারকগণ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিকে সত্য এবং স্বত:প্রবৃত্ত হিসেবে গ্রহণ এর উপর ভিত্তি করে পিটিশনারকে দন্ডাদেশ দিয়েছিলেন এটা বিবেচনা

না করেই যে, স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যটি দোষক্ষালনমূলক এবং এটি পিটিশনারের দোষী সাব্যস্তকরণের ভিত্তি হতে পারে না।

উপরোক্ত বিবেচনায়, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড জোড়ালোভাবে বলেছিলেন যে এই দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশটি সম্পূর্ণ অবিশ্বস্ত এবং মনগড়া গল্পের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত এবং সুতরাং, যুক্তিযুক্তভাবে আবেদনকারী নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার অধিকারী, তবে হাইকোর্ট বিভাগ এ বিষয়টিতে মনোনিবেশ করেনি।”

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব বিশ্বজিৎ দেবনাথ বলেন যে, আপিলকারীর দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য এবং স্বেচ্ছাকৃত এবং ট্রায়াল কোর্টের পাশাপাশি হাইকোর্ট বিভাগ যথাযথভাবে আপীলকারীর স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের উপর নির্ভর করে এবং তাকে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে। তিনি আরও বলেন যে পিডব্লিউ-৪ এবং ৫ এর সাক্ষ্যসমূহ অবিশ্বাস করার করার কোনও কারণ নেই এবং তারা সবচেয়ে উপযুক্ত সাক্ষী এবং তাদের প্রমাণসমূহ বাতিল করা উচিত হবে না, কেননা এগুলোর বৈধ ভিত্তি রয়েছে। বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অবশ্য ইউডি মামলায় প্রদত্ত বিবৃতি, এফআইআর এবং তদন্তের সময় প্রসিকিউশন পক্ষের তরফ হতে যে গল্প উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যখন আমরা এটি বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের নজরে আনি যে অভিযোগ গঠনের সময় আপিলকারীকে শিশু বলে মনে হয়েছিল এবং যখন তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল তখন আদালত তার বয়স নির্ধারণের কোনো প্রচেষ্টা করেনি, তখন বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাদেরকে কোনোও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি।

আমরা যে যুক্তিতর্কসমূহের উপর নির্ভর করে লীভ মঞ্জুর করা হয়েছিল সেগুলো, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের যুক্তি-তর্কসমূহ, তর্কিত রায় এবং রেকর্ডভুক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করেছি।

মৃত রওশন আলীর মৃত্যু সংক্রান্ত বর্তমান আপিলটি ১৯৯৬ সালের ২২.১২.১৯৯৬ তারিখের শার্শা থানার ইউ.ডি কেস নং ৩৯ হতে উদ্ভূত হয়েছিল যা দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে একটি নিয়মিত মামলায় রূপান্তরিত হয়েছিল ০৫.০১.১৯৯৭ তারিখে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে একটি নিয়মিত এফ.আই.আর দায়ের করার পর।

নিহত রওশন আলীর মৃতদেহে সুরতহালের সময় তার দেহের বিভিন্ন অংশে কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং ধারণা করা হয় যে ভিকটিমকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে, শাহজাহান আলী, মৃত রওশন আলীর পিতা অভিযুক্ত মো: শফিকুল ইসলামকে ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে এবং পুলিশকে অবগত করে যে, শফিকুল ইসলাম ২১.১২.১৯৯৬ তারিখ সন্ধ্যায় মৃত রওশন আলীকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় এবং তারপরে মৃত রওশন আলী ওই রাতে আর বাড়ি ফিরে আসেনি এবং পরের দিন সকালে রওশন আলীকে একাধিক আঘাতসহ খেঁজুড় বাগানে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে, ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে জিডি নং ৯৭৮ করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত শফিকুল ইসলামকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছিল। ২৬.১২.১৯৯৬ তারিখে মৃত রওশন আলীর ময়নাতদন্ত। রিপোর্ট যশোর জেনারেল হাসপাতাল থেকে তদন্তকারী কর্মকর্তা পেয়েছিলেন, যেখানে ডাক্তার অভিমত দেন যে মৃত্যু শক এবং ইন্ট্রাক্রানিয়াল রক্ষক্ষরণের কারণে হয়েছে যা মৃত্যু ও পূর্ববর্তী আঘাতজনিত এবং নরহত্যা প্রকৃতির। তদন্তের সময় অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম, মোঃ নাসির ও মোঃ নুরুজ্জামান প্রকাশ করে যে, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তারা নিহত রওশন আলীকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় এবং সে অনুযায়ী এফআইআর দায়ের করা হয়।

পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে আপিলকারী মোঃ শফিকুল ইসলাম ও সহ-অভিযুক্ত আবদুল খালেক ও নাসিরের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয়।

প্রসিকিউশন ১০জনের মত সাক্ষীকে পরীক্ষা করে যাদেরকে ডিফেন্স কর্তৃক জেরা করা হয়েছিল।

প্রসিকিউশনের মামলার মূল সাক্ষী হলেন পিডব্লিউ ৫, আব্দুল ওহাব, যিনি মৃতের পিতা মোঃ শাহজাহান, পিডব্লিউ-৪, কর্তৃক সত্যায়িত হন।

নিহত রওশন আলীর পিতা মোঃ শাহজাহান তার জবানবন্দিতে জানান, ঘটনার রাতে অভিযুক্ত নাসির ও শফিক তার ছেলে রওশন আলীকে খেঁজুরের রস খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে যায় এবং তার ছেলে ঐ রাতে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। এর কিছুক্ষণ পর পিডব্লিউ-৫ আবদুল ওয়াহাব, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য মাঠে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে তিনি পিডব্লিউ ৪ কে বলেছিলেন যে তিনি মাঠে ভিকটিম রওশন আলীর কান্না শুনেছিলেন। এরপর পিডব্লিউ ৪ নিজে, তার স্ত্রী, তার বোন ও চাচা আব্দুল ওয়াহাব (পিডব্লিউ ৫) টর্চ লাইট সাথে নিয়ে খেঁজুর বাগানে গিয়ে দেখেন যে, অভিযুক্ত নাসির, শফিকুল ও খালেক খেজুর-বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা অভিযুক্ত খালেককে দাঁ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং ভিকটিম রওশন আলীকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। ওহাব তার টর্চ লাইটটি অভিযুক্তদের দিকে তাকে করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পশ্চিম দিকে পালিয়ে যায়, তবে পিডব্লিউ-৪ এর সাথে পিডব্লিউ-৫ ওয়াহাব ঘটনাস্থলে অভিযুক্ত শফিকুলকে আটক করতে সমর্থ হন এবং একাধিক আঘাতসহ ভিকটিম রওশন আলীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। স্থানীয় লোকজনের জিজ্ঞাসাবাদে শফিকুল স্বীকার করেন, তিনি নিহত রওশন আলীর পা চেপে ধরেন এবং আসামি নাসির রওশন আলীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। পিডব্লিউ ৪ সহ অন্যরা অভিযুক্ত শফিকুলকে থানায় সোপর্দ করেন। জেরায়, পিডব্লিউ-৪ জানায় যে আপীলকারী শফিকুল গ্রামবাসীর কাছে তার অপরাধ স্বীকার করে এবং ভিকটিম রওশন আলীকে হত্যার বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না যে, এলাকার লোকজন অভিযুক্ত শফিকুলকে ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে আটক করেছে এটা তিনি বলেছিলেন কীনা। জেরায় তিনি বলেন যে,

ঘটনার পরের দিন তিনি পুলিশের কাছে মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করতে পারেননি, এ কথা সত্য নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে হত্যাকান্ড সংঘটনকারী ৩ আসামির নাম তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

পিডব্লিউ ৫, আবদুল ওয়াহাব তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে তিনি রাত ৯.৩০ টার দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলেন তখন তিনি কাছের খেঁজুর বাগানে একটা হৈ-হুল্লোড় শুনতে পান। বাড়ি ফিরে তিনি তার প্রতিবেশী শাহজাহান, কাসেম ও অন্যান্যদের কাছে বিষয়টি জানান এবং টর্চের আলো নিয়ে ঘটনার স্থানের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখেন অভিযুক্ত শফিক মাটিতে পড়ে থাকা রওশন আলীর পা চেপে ধরে আছেন। অভিযুক্ত নাসির ও খালেক পালিয়ে গেলেও অভিযুক্ত শফিকুলকে আটক করে পুলিশ। অভিযুক্ত শফিকুলকে নিকটস্থ পুলিশ ফাঁড়িতে হস্তান্তর করা হয়। জেরার সময়, তিনি জানান যে, যখন তারা অভিযুক্ত শফিকুলকে নিকটস্থ পুলিশ ফাঁড়িতে হস্তান্তর করেন তখন বেলা ১১.৩০ মিনিট। তিনি আরও বলেন, আসামি শফিকুল তার অপরাধের কথা জনগণের সামনে স্বীকার করেছেন এবং পুরো ঘটনার প্রকাশ করেছেন। জেরায় এরূপ সাজেশন দেওয়া হয়েছিল যে অভিযোগ হিসাবে এ জাতীয় কোনও ঘটনা ঘটেনি।

পিডব্লিউ ৬, এসআই মোঃ আবদুর রশিদ, জেরায় বলেছিলেন যে ২২.১২.১৯৯৬ তারিখে রাত ৯:৪৫ এর দিকে তিনি শার্শা থানায় পুলিশের উপ-পরিদর্শক পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এই তারিখে পিডব্লিউ-৪, মোঃ শাহজান, মৌখিকভাবে জানান যে তার ছেলে মৃত রওশন আলী তার বাড়ির পিছনের খেঁজুর বাগানে মারা গিয়েছে এবং তার মৃতদেহ সেখানে পড়ে আছে। পূর্বোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২২.১২.১৯৯৬ তারিখে শার্শা থানা ইউডি কেস নং ৩৯ দায়ের করা হয়েছিল এবং সাব-ইন্সপেক্টর শওকত আলীকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ০৫.০১.১৯৯৭ তারিখে প্রায় বিকাল ৫.১৫ এর দিকে শওকত হোসেন তথ্যদাতা হিসেবে এজাহার দায়ের করেন এবং অফিসার ইনচার্জের কাছে এটি জমা দেন। এজাহার পাওয়ার পরে, এই সাক্ষী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে ০৫.০১.১৯৯৭ তারিখে শার্শা থানায় কেস নং ১২ দায়ের করেছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর হাতে তদন্তভার তুলে দেন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তদন্তকালে স্কেচ ম্যাপ প্রস্তুত করেন। তিনি আপিলকারী শফিকুল ও নাসিরকে গ্রেপ্তার করে ফৌজদারি কার্যবিধির

১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করেন এবং তারা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। তিনি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় ৬ জন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তাকে বদলি করা হয় এবং তিনি কেস ডকেটটি অফিসার ইনচার্জ কে প্রদান করেন এবং সাব-ইন্সপেক্টর আবদুর রব বাকী তদন্ত শেষ করেন। জেরায় এই সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে মৃতের পিতা, যিনি ইউ.ডি. মামলাটি দায়ের করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তার ছেলে ঘুমের বড়ি নিয়েছিলেন।

তিনি অস্বীকার করেছেন যে এজহারে বলা হয়েছে আপিলকারীসহ অন্যান্য আসামিরা মৃতকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়, কিন্তু ইউ.ডি. মামলায় এটা বলা হয়নি। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারার অধীনে পুলিশ শফিকুলকে ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে গ্রেপ্তার করেছিল। পরবর্তীকালে, এই সাক্ষী (পিডব্লিউ ৬) বর্তমান মামলায় শফিকুলকে গ্রেপ্তার করে। তিনি প্রথমে ০৬.০১.১৯৯৭ তারিখে ঘটনার স্থানটি পরিদর্শন করেছিলেন। ঘটনার স্থানটি পিডব্লিউ-৪ এর বাড়ি থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে ছিল। নুরু মোল্লা খেজুর বাগানের মালিক হলেও তাকে এই মামলায় সাক্ষী করা হয়নি। তিনি জেরায় স্বীকার করেছেন যে, সাক্ষীদের কেউই বলেননি যে তারা নিহত রওশন আলীকে হত্যা করতে দেখেছেন। কোনো সাক্ষী বলেননি যে শফিকুলকে লোকজন আটক করেছে। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে কেউ বলেনি যে ভিকটিমকে বাড়ি থেকে ডেকে আনা হয়েছিল।

পিডব্লিউ ৭, এস.আই আব্দুর রব মামলার তদন্ত শেষ করেছেন এবং আপিলকারীসহ ৩ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

পিডব্লিউ ৮, মহিবুল হক, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, কনভিক্ট আপীল্যান্ট শফিকুল ইসলামের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। জবানবন্দীতে তিনি বলেন, আসামি শফিকুলকে বিষয়টি নিয়ে ভাবার ও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানের পরিণতি নিয়ে চিন্তা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছিল এবং অত:পর তিনি আইনের সমস্ত বিধান মেনে আসামি শফিকুলের

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং উল্লিখিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত এবং সত্য।

রেকর্ডভূক্ত উপাদানগুলি বিবেচনা করার পরে, আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং ট্রায়াল কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগ উভয় কর্তৃক প্রদত্ত রায় সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ অসন্তোষ ব্যক্ত করছি। কোনো আদালতই পিডব্লিউ কর্তৃক জবানবন্দী এবং জেরায় প্রদত্ত প্রমাণগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। এমনকি কোনো আদালতই পি.ডব্লিউ. ১, এ.এস.আই. মীর শওকত হোসেন, শার্শা পুলিশ ষ্টেশন, কর্তৃক ০৫.০১.১৯৯৭ তারিখে দায়েরকৃত এফআইআরটি বিবেচনা করেনি। এফআইআর-এ বলা হয়েছে যে, ২২.১২.১৯৯৭ তারিখ সকাল ৯.৪৫ এর দিকে পিডব্লিউ ৪ শাহজাহান মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন যে তাঁর ১৬ বছর বয়সী বড় ছেলে মোঃ রওশন আলীর ২১.১২.১৯৯৬ তারিখের পরের রাত হতে কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। পরের দিন (২২.১২.১৯৯৬) তাকে নুরু মোল্লার খেঁজুর বাগানে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এফআইআর-এ আরও বলা হয়েছে যে হইচই শুনে লোকজন ঘটনাস্থলে আসেন এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদে, পিডব্লিউ ৪ তাদের জানায় যে ২১.১২.১৯৯৬ তারিখের পরের রাতে মৃত রওশন আলী সম্ভবত শ্রীপুরে তৈরী ঘুমের বড়ি বা ট্যাবলেট খেয়েছিলেন এবং তিনি রাত ১১.৩০ টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান এবং খেঁজুর বাগানে মারা যান। প্রাথমিকভাবে শার্শা থানার উপ-পরিদর্শক মোঃ আব্দুর রাশেদ ২২.১২.১৯৯৬ তারিখে মৃতের পিতা পিডব্লিউ ৪ মোঃ শাজাহানের মৌখিক বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৬ সালের মামলা নং-৩৯ রেকর্ড করেন। এজাহারে আরও বলা হয়েছে যে সুরতহালে দেখা গেছে যে মৃতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি মারা যাননি। নিহতের বাবা-মা বা তাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন কেউই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানাতে পারেননি। ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে স্থানীয় লোকজন আপিলকারীকে আটক করে তাকে থানায় সোপর্দ করে। এফআইআর-এ আরও বলা হয়েছে যে সেই সময়ে আপিলকারীকে মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী, ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখে জিডি নং- ৯৭৮ দায়ের করা হয়েছিল এবং আপীলকারীকে ফৌজদারি

কার্যবিধির ৫৪ ধারার অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ০৫.০১.১৯৯৭ তারিখে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, যদিও ঘটনাটি ২১.১২.১৯৯৬ তারিখের পরের রাতে ঘটেছিল।

রেকর্ড পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট বিভাগ পিডব্লিউ-৫ আব্দুল ওয়াহাবকে ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বিশ্বাস করেছিল, যদিও ঘটনার ১৫ দিন পরে যে এফআইআর বা জিডি দায়ের করা হয়েছিল তাতে, অথবা পিডব্লিউ-৪ কর্তৃক ২২.১২.১৯৯৬ তারিখে করা জিডি বা মৌখিক অভিযোগে অভিযোগ করা হয়নি যে পিডব্লিউ-৫ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। এখন পিডব্লিউ ৪ এর প্রমাণের দিকে আসা যাক, নিহতের পিতা মোঃ শাহজাহান, যার মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯৯৬ সালের ২২.১২.১৯৯৬ তারিখের ইউডি কেস নং-৩৯ দায়ের করা হয়েছিল, তাতে তিনি অভিযোগ করেননি যে আপীলকারী ভিকটিমকে হত্যার সাথে জড়িত ছিল বা তাকে যে কোনওভাবে ভিকটিমদের হত্যাকারী হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছিল।

পিডব্লিউ-৪ এবং ৫ এর সমন্বিত প্রমাণগুলির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে ঘটনার সময় টর্চ লাইট দ্বারা আপীলকারীকে শনাক্ত করার বিষয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবৃতি রয়েছে এবং ঘটনাস্থলে আপীলকারীর আটকের কথিত গল্পটি হল সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরবর্তীকালে একটি নতুন গল্প তৈরি করা হয়েছিল এবং যদি আপীলকারীকে ভিকটিমদের হত্যাকারী হিসাবে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হয়, তবে প্রাথমিকভাবে একটি ইউ.ডি মামলা এবং তারপর হত্যাকারী হিসাবে আপীলকারীর নাম উল্লেখ না করে একটি জিডি এন্ট্রি করার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অতএব, পিডব্লিউ-৪ এবং পিডব্লিউ-৫ এর প্রমাণ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমরা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে আপিলকারীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বিবেচনা করেছি। হাইকোর্ট বিভাগ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটিকে সত্য ও

স্বেচ্ছাকৃত বলে গ্রহণ করে এবং এর ওপর নির্ভর করে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে। আবেদনকারীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিম্নরূপ:

"The statement of মো: শফিকুল ইসলাম

Aged about 16 years made in the বাংলা language

My Father's name **রং মোঃ চন্দালী মোড়ল**

I am by caste gymwjg

My home is at Mouza-**বৃত্তিআচড়**

and by occupation-**ছাত্র**

Police Station-**যশোর**

I reside at-**বৃত্তি আচড়া**

আমি গত ২১/১২/৯৬ তারিখ অনুমান রাত ৮.০০ টার সময় বাড়ি হতে গ্রামের দোকানদার হারুনের দোকানে যাই। দোকানে রওশন এর সাথে আমার দেখা হয়। আমরা দুইজন বসা ছিলাম। কিছুক্ষন পরে নাসের পিতা আঃ খালেক উক্ত দোকানে আসে। রওশন বিড়ি ও কলা কিনে আমাকে একটি কলা দেয়। রাত ৮.৩০ টার সময় আমরা ৩ জন বাড়ির দিকে আসিতে থাকি। কিছুদুর আসার পর নাসির আমাকে বলে যে, নুরু মোল্যার খেজুর বাগান হতে খেজুরের রস হইতে চল। নাসিরের কথামত আমরা খেজুর বাগানে যাই। আমি রসের ভার খুলিয়া নামাইলে নাসির আমাকে বলে যে, রওশনকে ধর। সাথে সাথে রওশন নাসিরের গলা চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। ঐ সময় নাসিরের বাবা আঃ খালেক আসে। খালেক আমাকে রওশনকে চাপিয়া ধরিতে বলে। আমি ভয়ে রওশনকে মাটিতে চাপিয়া ধরি। খালেকও চাপিয়া ধরে। নাসির তখন রওশনের গলা চাপিয়া মারিয়া ফেলে। নাসির ও তার বাবা খালেক বলে যে, এই কথা

আসামীকে তার প্রদত্ত জবান বন্দি পড়ে শোনানো হয়। তার স্বীকারোক্তি আমার নিকট সত্য ও স্বেচ্ছা প্রনোদিত বলে আমার মনে হয়।”

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে এই বিবৃতিটি ২২.১২.১৯৯৬ তারিখে দায়েরকৃত ইউ.ডি কেস নং ৩৯ এবং ২৫.১২.১৯৯৬ তারিখের জিডি নং- ৯৭৮ তে প্রদত্ত বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। পিডব্লিউ ৪ এবং ৫ বলেছিল যে ঘটনা যেদিন ঘটেছিল সেদিন গভীর রাতে তারা উভয়ই আপিলকারীকে আটক করেছিল। তবে তাদের প্রমাণগুলি ইউ.ডি মামলায় দেওয়া বিবৃতি এবং পিডব্লিউ-৪ এর দায়ের করা জিডি দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত আপিলকারীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি যদি রেকর্ডে থাকা অন্যান্য প্রমাণের সাথে বিবেচনা করা হয় তবে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য এবং স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বলা যাবে না। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে প্রকাশিত হয় যে আপিলকারীর বয়স ১৬ বছর ছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি একজন ছাত্র ছিলেন। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আপিলকারী বলেন, নাসিরের ভয়ে তিনি নিহতকে জাপটে ধরে ছিলেন। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি হতে আরও জানা যায়, নিহত রওশন আলীকে অভিযুক্ত নাসির শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত বিবৃতিতে, যা ২৭.১০.১৯৯৯ তারিখে রেকর্ড করা হয়েছিল, আপিলকারীর বয়স ৪২ বছর উল্লেখ করা হয়েছিল। এই অসঙ্গতি কোন আদালত কর্তৃক বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। অভিযোগ গঠনের সময় আপীলকারীর বয়স ১৬ বছরের কম হয়ে থাকলে শিশু আইন, ১৯৭৪ এর বিধান অনুযায়ী তার বিচার সঠিক হয়নি।

মামলার সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা মনে করি যে এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য বা স্বত:প্রদত্ত নয়। তাই অভিযুক্ত অপরাধে আপিলকারীকে যুক্ত করার কোনো প্রমাণ রেকর্ডে নেই। এফআইআরে অসংগতি প্রসিকিউশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে রেকর্ডকৃত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এটাই নির্দেশ করে যে প্রসিকিউশন সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে তার মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তদনুসারে, এই ফৌজদারি আপিলটি মঞ্জুর করা হলো এবং আপিলকারীকে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ থেকে খালাস প্রদান করা হলো, যিনি ইতিমধ্যে ৩১.০১.২০২১ তারিখের অগ্রিম আদেশের মাধ্যমে কারাগার হতে মুক্তি পেয়েছেন।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।